পুষ্পিত অশোক গায় : মুর্শিদাবাদের লোককথা

শক্তিনাথ ঝা

নবকুমার থাকে জিয়াগঞ্জে, স্টেশনের কাছে। ওর একটা বড় দল ছিল আলকাপের। দরকারে করতো পঞ্চরস। শ্রাবণে দেবী মনসার গানও করতো। বছরে অনেকগুলি অভিনয়ের সূত্রে দলের লোকেরা, বিশেষত ছোকরা এবং বাদ্যকরেরা দু'টো পয়সা পেত এবং দলে সংলগ্ন থাকতে। নবকুমারেরা চাঁই গোষ্ঠীর মানুষ। বড় দাদা এবং নিকট আত্মীয়েরা দলভুক্ত থাকায়, স্বল্প সময়েও অভিনয়ের আয়োজন করে দিত। চাঁইদের অনেকেই করে সব্জির ব্যবসা। অভিনয়ের জন্য নবকুমার নিয়মিত ব্যবসা ছেড়ে দেয়। কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে নাটকের এক কর্মশালায় দাপটের সঙ্গে আলকাপ করে দেখিয়েছিল নবকুমারের দল। দিল্লির এক গবেষক সংস্থা ওদের নাটকের তথ্যচিত্র করেছে।

মুর্শিদাবাদে গত এক দশক চলেছে প্রবল ভাঙ্গন। পদ্মা-গঙ্গার ভাঙ্গনে নয় লক্ষাধিক লোক পায়ের তলায় মাটি হারিয়েছে। সাংস্কৃতিক - সামাজিক - অর্থনৈতিক ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে বহু মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি। গরিব চাষী এবং গ্রাম্য ভূমিহীন বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এক সঙ্কটময় সময় এখন। কলকারখানার কর্মীদের মজুরী বৃদ্ধি ঘটেছে। তুলনামূলকভাবে কৃষিক্ষেত্রের পণ্যের দাম অথবা খেতমজুরদের মজুরী সেভাবে বাড়েনি। কৃষি বনাম শিল্পপণ্যের অসম বিনিময়ের মাধ্যমে কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠী দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। কৃষি সার, বীজ, বিশ, সেচ, মাড়াই কল, ট্রাক্টারাদির খরচ বেড়েছে বহুগুণ। এবং এগুলির উৎপাদন ও বিপণনের ভার নগরের শিল্প উৎপাদকদের। এমন কী কৃষি পণ্যের বিপণন নিয়ন্ত্রণ করে না কৃষি উৎপাদকেরা। একচেটিয়া কিছু বাণিজ্য পুঁজি এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ফসল ওঠার মুখে দাম থকে কম। এমনকী সরকার নির্ধারিত মূল্যের ক্রেতা না পাওয়ায় গরিব চাষিরা কম দামের ফসল বেচে। (Distress Sale)। মাস তিনের পরেই ফসলের দাম বেড়ে যায়। ভূমিহীনেরা অধিকতর মূল্যে তাদেরই উৎপাদিত চাল, ডাল, গম কেনে। গত দু'বছরে চালু, সব্জি, ডাল, গমের মূল্যবৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকা দুর্বহ হয়েছে। কিন্তু পণ্যমূল্যের এ লাভ কৃষক পায় না। উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধির ফলে এ লাভ শেষ পর্যন্ত শিল্প - পণ্য উৎপাদকদের ঘরেই ঢোকে। গত কয়েক বছরে গ্রামে পণ্য চলাচল বেড়েছে বহুগুণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে আঞ্চলিক উৎপাদন ও স্থানীয় বাজারের বিশেষ পণ্যের সস্তা দাম আর নেই। বনজ শাক সব্জি, মেটে আলু, গেড়ে গুগলি, ছোট পশু - পাখি কতক লুপ্ত, প্রায় সবগুলিই পণ্য হিসাবে বাইরে চলে যায়। গ্রামের প্রতি ইঞ্চি জমির উপর ব্যক্তি অধিকার প্রবল। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আর গ্রামে বাঁচা যায় না। ফলত গ্রামে বেঁচে থাকার মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, দরিদ্র মানুষের যথার্থ আয়ের চাইতে ব্যয় অনেক অনেক বেশি। নিঃস্ব রামপ্রসাদ নব্য জমিদারতন্ত্রের উদ্ভবের কথা বলে, অশেষ দুঃখ প্রকাশ করে লিখেওছিলেন, ''আমার শাকে নুন মেলে না।'' তাঁর, এখন হলে বনজ শাকও মিলত না। প্রকৃতির নির্ভর সর্বহারা এবং আদিবাসীরা অনিবার্য কারণে এখন অনাহার মৃত্যুর তালিকা বাড়ান। অথবা অপুষ্টি জনিত মৃত্যুকে তিল তিল করে বরণ করেন।

গ্রামে কৃষি উৎপাদনের রূপান্তরে শ্রমজীবী জনতার কাজের পরিমাণ বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য অধিকতর পরিশ্রম করতে গিয়ে অবসর প্রায় লুপ্ত হয়েছে। পরিবারের নারীদের কাজের জন্য গৃহের বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। অথবা বাড়িতেই বিড়ি বাঁধা থেকে নানা কাজ বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয় সংসার চালানোর জন্য। গ্রামেগঞ্জে নব্য - ধনীদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং গ্রামে নিত্য - প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম শহরের মতোই। শিল্প পণ্যগুলির দাম অধিকতর। অধিক সময় ব্যয় করে অধিকতর উপার্জন করতে গিয়ে শ্রমজীবীদের জীবনে অবসর প্রায় নেই। কৃষি - উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত জীবনে আট ঘন্টা অধিক শ্রম - দিবস; ধর্মঘট নেই, নেই কোন ধরনের সবেতন ছুটি। সারা বছরের প্রায় প্রতিদিনই তাদের দিনগত উপার্জনে পেট চালাতে হয়। অনেক অনেক আগে মধ্যবঙ্গের নিম্নবর্গের হিন্দু ও ইসলামি সমাজে ভাদ্র মাসেই ভাদই ধান উঠত। আমন ধান্য রোপন শেষ করে প্রবল বর্ষণে জলাজমিতে কোন কৃষি কাজ না থাকায় অবসর পেত গ্রাম্য শ্রমজীবীরা। ছিটানো নতুন ধানে এক দিকে শুরু হত ভাদুগানের ও প্রতিযোগিতার উৎসব। অন্যদিকে গ্রামে গ্রামে আসর বসত 'ভাদ্রের কাহানি' বলার। এ সমস্ত গ্রাম্য কথকদের আমরা কালিদাসের কাল থেকে চিহ্নিত করতে পারি। কতক গল্পের কত বিভঙ্গ। গানের গল্প, গানে অথবা ছড়ায় গল্প, কিস্সা, উপকথা / রূপকথা। গত কয়েক বছর থেকে ভাদ্র মাসের কাহানির গ্রাম্য আসরগুলি কমতে কমতে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। তিন চার রাত ধরে গল্পের বিস্তার শ্রবণের বিনিদ্র শ্রোতা প্রায় নেই। অখণ্ড অবসরের বিশেষ ঋতু কৃষি - নির্ভর জীবনে বদলে গেছে। পাল্টেছে রুচিও। গতানুগতিক জীবনের ছোট ছোট দুঃখসুখের কথা বিশেষ আকর্ষণ করে না তরুণ প্রজন্মকে। টি . ভি. এবং ভিডিও হলে ও ক্যাসেটে তারা যে সকল দৃশ্যচিত্র দেখে তা রোমাঞ্চকর, নয়া প্রযুক্তিতে মনোমুগ্ধকর। খুন জখম, বলাৎকার, মারামারিতে সেগুলি জমাট। আর ব্লু ফ্লিমের রমরমা এখন গ্রামে গঞ্জে। স্কুলের ছাত্র - ছাত্রীরা এগুলি ব্যাবহার করে, নব্যধনীরা রাতের দ্বিতীয় প্রহরে টি.ভি তে যন্ত্র লাগিয়ে এগুলি দেখে; ভিডিও হলেও দেখা যায় এগুলি। বিশ - পঁচিশ টাকায় মেলে এসব ক্যাসেট। ফলত ভাদ্র মাসের কাহানির কোন শ্রোতা নাই; চাহিদা নাই। নতুন করে এ গল্প কেউ শিখতে চায় না। গল্পকারদের এক কর্মশালায় (ভগবানগোলার সুন্দরপুর) দাবি উঠেছিল যে রেডিও টি.ভি.তে এসব গল্প পরিবেশিত হোক। তাহলে এগুলি বাঁচবে। এককালে রাওলপিন্ডির বাজারে কাহানিকারেরা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে থাকতেন; খরিদ্দার আসত গল্প খরিদ করে শুনতে। হায় রে, কবে কেটে গেছে কাহানিকারদের কাল। আলকাপের দলপতি নবকুমারের কথায় ফিরে আসি। আলকাপের রাজা ঝাকসু মণ্ডলের আমলেই নৃত্য - গীত পটিয়সী মেয়েরা আলকাপে নামে, জনপ্রিয় এ লোক - আঙ্গিকটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে গ্রাম্য জুয়াড়িরা এবং কৌতুকনাট্য আলকাপ যৌনতার পঞ্চরসে পরিণত হয়। সবুজ বিপ্লবের গ্রাম্যধনীরা পঞ্চরসের পৃষ্ঠপোষক হয়। সেখালে বিস্তর পয়সার বিস্তর পঞ্চরসের দল আসরে নামতে। মদ, জুয়া এবং যৌনতার ত্রিবেণী সঙ্গমের পঞ্চরস থেকে নারী সমাজ, বালক - বালিকারা দূরে থাকতো। রক্ষণশীল অভিভাবকেরা, ফরাজি গ্রাম্য - সমাজ এগুলির তীব্র বিরোধী ছিলেন। গ্রাম্য জুয়াড়িরা ক্রমে হারিয়ে গেছে। গঞ্জে নিত্যদিন কমপিউটারের জুয়া চলে, লোটোতে দেশ ছেয়েছে। মদের ভাটি যেখানে নেই, বিড়ি-সিগারেট - গাঁজা-আফিং অথবা এল. এস. ডি. পাওয়া যায় না সেখানে; সে গ্রাম গ্রামই নয়। নীল ছবিতে শ্বেতকায় নগ্নিকাদের সঙ্গে অসম পাল্লায় টিকতে পারে না রোগা - কালো মেয়েরা, গোফ কামানোর সঙ্গী ছোকরারা। গত দু'বছরে মুর্শিদাবাদের কোন গ্রাম থেকে বা মেলা উৎসব থেকে আলকাপের কোন ডাক আসেনি। এ জেলার বারোটি সংগঠিত আলকাপ দল ভেঙে গেছে। রঘুনাথগঞ্জের হতাবের ছিল পঞ্চাশ জনের এক পঞ্চরসের দল। সে

কী প্রতাপ ছিল মহতাবেবর। মালদহে অভিনয় চলতে চলতে ডাক আসে দিনাজপুর থেকে; কিন্তু ঝাড়খণ্ডে বায়না হয়ে আছে যে! ১৯৯৫ -এ আমরা এক আলকাপ উৎসব করেছিলাম মহালন্দী গ্রামে। বিস্তর ব্যয় হবে ও-জন্য দল নিয়ে নয়, একাই এসেছিলেন মহতাব। সে কালের বিখ্যাত ছোকরা ইন্দু দাস বৈরাগী, ঝাঁকসুর কন্যাদ্বয় চিনি ও মীরাকে নিয়ে তাৎক্ষণিক দল গড়ে মহাতাব আলকাপ পরিবেশন করেছিলেন মহালন্দীতে। কেপে বা কৌতুকাভিনেতা ছিল গোপাল চাঁই/ মণ্ডল। দীর্ঘদেহী সুদর্শন মহাতাব নারী ভূমিকা নিয়েছিল। তা দেখে অসন্তুষ্ট ঝাঁকসুতনয়া চিনি বলেছিল, ''অত রং ঢং আমরা করতে পারি না''। অতিরঞ্জিত নারী ভূমিকায় এবং গানে, অভিনয়ে প্রখ্যাত মহাতাবের এখন দিন কাটে অভাবে, দুর্দশায়। আর সেই যে গোপাল কেপে! ও আটদশরকম ভঙ্গি তে হাটতে জানত, যে কোন ভঙ্গিতে স্থির স্ট্যাচু হয়ে থাকতে পারত, হরবোলাও ছিল গোপাল। এখন গরমে আইসক্রিম বেচে ছড়া কেটে। আর অল্পবয়সি ছেলে মেয়েদের 'বোবা নাচে' নেপথ্য সঙ্গীত গায়। কখনও বা আদিরসাত্মক গানে নামানে হয় ওকে। আলকাপের আসরে গোপাল, মহতাবদের দেখা যায় না।

নবকুমার কিন্তু বদলায়নি। কদিন আগে বহরমপুরে বড় পোস্টাফিলের সামনে এক রিক্সার সিটে পা তুলে বসেছিল রাজার ভঙ্গিতে। ধীরে নেমে এল চায়ের দোকানে। জিজ্ঞেস করলো — ''স্যার চা খাবেন নাকি?'' বললো, ''ভোরের ভাগীরথতে এসেছি; রাতের ভাগীরথীতে বাড়ি যাব। চলেন না আমাদের বাড়িতে।'' ''কী করবে সারাদিন?''

''রিক্সা চালাবো। রিক্সা চালাই আজকাল। মাঠের কাজে খাটুনি বেশি, আয় কম।''

একদিকে যেমন সারাবছর ধরে চাষাবাদে, কৃষিতে শ্রমদিবস বেড়েছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বেড়েছে কৃষিশ্রমিকদের সংখ্যা। গ্রামের ঘরামি, কামার, তাঁতি, কলু, শঙ্খ বণিক প্রমুখেরা নিজেদের বৃত্তি হারিয়ে ভিড় করেছে কৃষিতে। ধনতন্ত্রের অনিবার্য গতিতে প্রান্তিক চাষিরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছে চলেছে। মাদক, যৌনতা, জুয়ার মতোই পণপ্রথা আক্রমণ করেছে তপশিলি এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীকে। গ্রামে - গঞ্জে সর্বত্র সোনার দোকানের বকলমে চড়াহারে সুদের ব্যবসা চলে। গুরুতর অসুখে, মামলা — মোকদ্দমায়, পণ্যের টাকার জন্য ধার নিয়ে ক্রমে জনতা সর্বহারা হয়। নদীর ভাঙনে বিপুল সংখ্যক মানুষ সর্বহারা শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। কৃষিতে অথবা পঞ্চায়েতে এদের কাজ নেই। আর মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ থেকে পলাশি পর্যন্ত ভূখণ্ডের একাংশ প্রকৃতির অনবদ্য সৃষ্টি। এ ভূখণ্ডে পাট, গম, আম - কাঁঠাল - সিঙ্গাপুরী কলা সহ যে কোন ফল, সবধরনের ধান এবং পর্যাপ্ত বিভিন্ন সব্জি উৎপাদিত হয়। ছোট চাষিরা কৃষি বিপ্লবের বহু আগে থেকেই নিবিড় চাষের সারা বছর ধরে নানা ফসল উৎপাদিত করে থাকেন এখানে। এ ভূখণ্ডের রেল লাইন, চওড়া রাজপথ ভূমি গ্রাস করেছিল অনেক আগেই। হালে সভ্যতা উঠে আসছে রাজপথের দুধারে কৃষিজমিতে। প্রকৃতির অনবদ্য নির্মিত এ কৃষিজমিতে তৈরি হয়ে চলেছে গঞ্জের বাড়ি ও বাজার; হোটেল মোটেল, চালকল, ময়দাকল, পেট্রোল পাম্প, হরেক কিসিমের কারখানার জন্য সস্তাদরে জমি কিনে নিয়েছে অনেকে, অর্থাৎ অধিক ফলনশলী কৃষি পরিণাম কমেছে। অথচ বন্ধু বেলডাঙ্গার চিনিকলে, কামিজ বাজারের বস্ত্র বয়ন কেন্দ্রে কেউ শিল্প তালুক গড়তে উদ্যোগ না নিয়ে, উল্টোভাবে কৃষিজমিতে শিল্পতালুকের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। স্থাবর জমিতে মূলধন বিনিয়োগ আখেরে অনেক 'নাফা' দেবে। এ জেলার কোথাও পরিবেশ সহায়ক কর্ম সংস্থানের শিল্প তালুক গড়ে উঠেনি। কৃষিভিত্তিক কোন শিল্পেও নেই কারও মনোযোগ। বরং ফলে রসের পরিবর্তে 'ন্যানো' গাড়ি চড়বো। বিনষ্ট পরিবেশে মৎসচাষিরা জীবন ও জীবিকা থেকে উৎখাত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির আটা কল, মুড়ি ভাজার কল, সিমুই তৈরির কল, ট্রাক্টর, ট্রেকার, চালকল, প্রভৃতি গ্রামীণ শ্রমকে সঙ্কুচিত করেই চলেছে। আগাছানাশক বিষ নিড়ানিতে শ্রম কমায়, সামান্য ফলিডল পুকুরে দিয়ে, অনেক মাছ ধরে। সর্বোচ্চ মুনাফার এক বিকৃত ছবি এ জেলার বিকৃত সামন্ত ঐতিহ্যে ফুটে ওঠে।

এরই অনিবার্য ফলে এ জেলার কৃষিশ্রমিকেরা অস্থায়ী বা স্থায়ী ভাবে কলকাতা, দিল্লি বোম্বাই, কেরল, সুরাট, গুজরাটে চলে যায়। নিয়ে যায় বাড়ির মেয়েদেরও। গৃহনির্মাণ, পাইপলাইন মেরামত বা স্থাপন ইত্যাদিতে কাজ করে পুরুষেরা। মেয়েরা করে ঝি-এর কাজ। মুর্শিদাবাদের প্রবাসী শ্রমিকদের দিল্লি, বোম্বাই, গুজরাটের বহুতল নির্মীয়মান বাড়িতে, অথবা বস্তিতে বহু সংখ্যায় খুঁজে পাওয়া যায়। বহু জোলা বা তাঁতি গ্রাম এখন প্রায় পুরুষশূন্য।

জীবনের স্থিতির বিনষ্টি পালটাচ্ছে সাজ - পোষাক, জীবনচর্যা এবং মূল্যবোধ। পুরনো ধর্মের মাদক বিরোধী অনুশাসন, অথবা সুদের প্রতি ঘৃণা মুসলমান গ্রামে আর নেই। একাধিক বিবাহ এবং তালাকে, পণে জর্জরিত মুসলমান মেয়েরা। ছোট ছেলে - মেয়েদের বাঁচবারজন্য অনেক বিক্রয় করে, গঞ্জে, শহরে সস্তায় বেচে দেয়। মূল্যবোধহীন রাজনৈতিক আগাছা পার্থেনিয়ামের চাইতেও দ্রুত বেড়ে চলেছে নিম্নবর্গের জীবনে। আত্ম - স্বার্থে, অসামাজিক কার্যেই রাজনীতির (ভোটের) শরণ নেয় গ্রামের মানুষ। প্রথাগত সংস্কৃতি থেকে জীবন বাস্তবতা তাদের উপড়ে ফেলছে। ঐতিহ্যবাহিত সংস্কৃতি - জীবনের পরিবর্তনে নিরাশ্রয় হয়ে যাচ্ছে। এ শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসছে ভোগবাদী পণ্যসংস্কৃতি। দিন যাপনের গ্লানিতে অদৃশ্য হস্ত তাদের সামনে দিচ্ছে জুয়া, যৌনতা এবং মাদক। দুর্দশার জীবনে ক্ষণিক উন্মাদনায় তারা ভুলে, সুস্থ জীবনের স্বপ্ন হারিয়ে ফেলেছে যে।

ধর্মের শক্ত বর্ম কাউকে কাউকে রক্ষা করছে। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত মনসার গান, বোলান, ভাদু, মহরমের মর্শিয়া, জারি প্রভৃতি পরিবর্তনকে মেনেও বেঁচে থাকছে। দৃঢ় বিশ্বাসে নামগান এবং কীর্তন ও মহাজনী বাউল গানে বৈষ্ণব সাধু উৎসব এখনও মুখর থাকে। কিন্তু বড় মেলা যেমন জয়দেব বা অগ্রদ্বীপের ভোল পালটাচ্ছে। সত্যিকারের সাধকেরা, আদর্শবাদী শিল্পীরা এখন অন্ধকারে আত্মগোপন করেছেন। পণ্য সংস্কৃতির আলোকিত লোকমঞ্চে আর তাদের মানায় না। কিন্তু প্রতিবাদ ক্রমশ বাড়ছে, দেখা দিচ্ছে নিঃশব্দ প্রতিরোধ। বহু লোকস্রষ্টা এখন্য সুস্থতার স্বপ্নেই আছেন।

লোকশিল্পের এবং সংস্কৃতির বাজার এবং চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় পণ্য - সংস্কৃতির উৎপাদকেরা নয়া প্রযুক্তি সাহায্যে ভূমিপুত্রদের কণ্ঠ থেকে কেড়ে নিচ্ছে তাদের গান। বিভিন্ন ব্যান্ড নানা লোকগান, বাউলগান গাইছে। মুসলমান মেয়েরা যে বিয়ের গান গাইতো বিয়ের সময়, সানাই বাদক যে সানাই বাজাত উৎসবে; একবেলা ভরপেট শিল্পীর খাওয়ার খরচের কমেই তার ক্যাসেট পাওয়া যায়। বিপন্ন শিল্পীরা বিষণ্ণ হয়ে এগুলি শোনে।

সি. পি. আই. (এম) প্রভাবিত লোকশিল্পীদের এক সংগঠন কয়েক মাস আগে কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে লোকশিল্পী সমাবেশের এক ডাক দিয়েছিল। তাদের প্রচারপত্রানুসারে শিল্পীদের বার্ধক্যভাতা, নিখরচায় ট্রেনবাসে যাতায়াত, চিকিৎসার সুযোগ, পরিচয়পত্র জীবনবিমা, অধিকতর অনুষ্ঠান ও মঞ্চ, সরকারী অনুষ্ঠানের ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবি ছিল। আর ছিল সরকারি শিল্পনীতিকে সমর্থনের প্রতিজ্ঞা। শিল্পীরা অনেকে গিয়েছিল। তাদের শিল্পনীতির সমর্থক হিসাবে দেখানো হয়েছিল। আমেরিকার আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান নিয়ে জনৈক শিল্পী তার গান খুলতেই পারেননি। শিল্পীদের দাবি শুনেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নেতারা বলেছিলেন, ''হবে, হবে'' (অজিত

পাণ্ডের গান শ্রোতব্য)। কয়েকদিন আগে আবারও বহরমপুরে লোকশিল্পীদের সিঙ্গুরে ন্যানোর দাবিতে জমায়েত ছিল।

(১) জনৈক স্বাধীন বিত্তার (প্রবীণ রায়বেঁশের শিল্পী এবং দলপতি) দৈনিক ষ্টেটম্যানের সাংবাদিককে বলেছেন যে শিল্পীদের দাবি দাওয়ার জন্য এ জমায়েত তাদের ডাকা হয়েছিল। কিন্তু এসে দেখে অন্য প্রসঙ্গ। কলকাতার লোকশিল্পী জমায়েতে যে সকল দাবি বিবেচনা কথা দেওয়া হয়েছিল, তার কী অবস্থা? এগুলির একটুও পূর্ণ হয়নি। এ অভিযোগ জানানোর আগে বামপন্থী নেতাদের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন, ''হবে, হবে''। ভদ্রলোকের এক কথা, এখনও তারা হবে না বলেননি; বলেছেন ''হবে' কিন্তু কবে; কোথায়? সেটা বুঝবার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নেই লোকশিল্পীদের; বর্তমান লেখকেরও।

ভাঙনের এ সময় প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ সহজাত উপাদান হিসাবে প্রাদুর্ভূত হয় লোকসমাজে। একদিন এসমস্ত তরল এবং বায়বীয় উপাদান কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়ে ধ্রুব নক্ষত্রের মহিমায় উজ্জ্বলিত হয়ে আমাদের পথ দেখাবে। লোকসাধারণ তিমির বিলাসী নয়, তিমির বিনাশে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকে। প্রচলিত জীবন এবং সংস্কৃতির ধ্বংস ও বিনাশের মধ্যেই রচিত হয়ে চলেছে আগামী উন্নত ভবিষ্যৎ। যাদের ঘরে জ্বলে না আলো; তারাই তো পথে - প্রান্তরে গঞ্জে - গ্রামে বাতি জ্বালেন। জীবনে পশ্চাদ্‌গমন নেই; সত্যের পরাজয় নেই। সুতরাং হতাশা শেষ কথা হয় না। লোক - সাধারণের ইতিহাস এ সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

মহালন্দীর অদূরে এক বিদ্যুৎ? - বিদ্যালয়হীন সাঁওতাল গ্রামে মাত্র দু-জনের জমি আছে। চারপাশের সব জমি, এমনকী সরকারি খাস জমিও সাঁওতালেরা পায়নি। গ্রামের সকল নরনারী শ্রমিকের কাজ করে। পুরুষদের মধ্যে মাদকাসক্তি বেড়েছে। সংসারের উপার্জন এবং চালনায় মেয়েরা গলদঘর্ম হয়ে যায়। একসময় সাঁওতালদের শুভ্র দাঁত, উজ্জ্বল পরিষ্কৃত বাসন এবং ঝকঝকে নিকানো মাটির বাড়ির প্রবাদ - প্রতিম খ্যাতি ছিল। কিছুদিন আগে মুম্বাই এর টাটা ইন্সটিটিউট - এর নৃতাত্ত্বিক এক বন্ধু চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একটি দল নিয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। (২) নবগ্রাম এবং সাগরদিঘিতে নাকি কালাজ্বরের প্রকোপ ভারতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ জ্বর সংক্রামিত হয় এক বিশেষ ধরনের মাছির মাধ্যমে এবং মামড়ে। এ মাছিরা বাস করে জলীয় স্যাঁতসেঁতে মাটির ফাটলে। এ মাছিদের বাসস্থান মূলত ঝাড়খণ্ড এলাকা। কোনভাবে বাহিত হয়ে তারা মুর্শিদাবাদে উপনীত হয়েছে। সাগরদিঘি, নবগ্রাম অনেক সাঁওতাল জনতার বাস। (এক) তারা শুয়োর পালনের জন্য কর্দমাক্ত গর্ত রাখে (দুই) মাটির দেয়ালের ঘরে তারা বাস করে।

ডিভোর্স করেছে রোজিনাকে তার স্বামী। দু-ছেলে মেয়েকে নিয়ে সে অতি কষ্টে দিন মজুরী করে সংসার চালায়। সাঁওতাল নারীরা সন্তান পালন, রান্না, মজুরী করে আগের মতো বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে পারে না। এরই সুযোগে কালাজ্বরের বাহক মাছিরা দেওয়ালের ফাটলে বাসা বেঁধেছে। আগের মতো নাচ-গানে সময় বা মন দিতে পারে না এ গাঁয়ের মেয়েরা। নাচ - গান মান কমে গেছে, কিন্তু এখনও থামেনি। গ্রামের আদিবাসী চিকিৎসক মারা গেছেন, অলচিকি জানা শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলের অভাবে শিশুরা বাংলা স্কুলে পাঠ নিতে গিয়ে ভাষাগত সমস্যায় বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে। সাঁওতাল পুরুষদের বড় অংশ উপার্জনের বড় অংশই নেশায় ব্যয় করে। সামগ্রিক উন্নতির কোন কিছুতেই কারও গা নেই। গ্রামের অধিকাংশ রেশন কার্ড থাকে 'দিকু' এক ডিলারের কাছে। মাঝে মাঝে সামান্য কেরোসিন তেলে রোজিনা একটা মাত্র ডিবা জ্বালাতে পারতো। তা রান্না শেষ করে, দিতো মেয়েকে পড়তে। বিউটি, জানকী, পয়সার অভাবে সে তেলও সব সময় কিনতে পারতো না। রেশন বিক্ষোভের সময় জ্বলে উঠেছিল আদিবাসীরা। রেশন ডিলারের ঘরে দেয়াল ভেঙেছিল এখানে। গ্রামের কয়েকজন মহিলা নাচ-গানের আখড়াটি বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত করতে চায় (২) মহিলা শ্রমিকদের শিশুদের জন্য একটি শিশু রক্ষণাগার চায় (৩) একসময় গাছপালা দিয়ে অনবদ্য সাঁওতালি চিকিৎসার ঐতিহ্য ছিল। রোজিনার বাবা এ চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ রকম বহু গাছ সংগ্রহ করে রোজিনা বিউটি নিজেদের উঠানে লাগিয়েছে। অশোক গাছটি খরায় জলাভাবে মরে গেছে। আরেকটি অশোক গাছ লাগাবে তারা। তাদের তরুণী কন্যার পদাঘাতে সে অশোকে ফুল ফুটবে। সে শিক্ষিত কনক্যা নতুন গান রচনা করবে। তাতে সুর দেবে তরুণ এক সাঁওতাল যুবক। সে গান হবে অশোকের, নব জীবনের।

দুর্দিনে লোকশিল্পীর এক আত্মরক্ষার দৃষ্টান্ত হিসাবে অধীর মণ্ডলের নাম করা যেতে পারে। বহরমপুরে যুগাগ্নির উৎসবে তাকে এবং তার দলকে 'লেটো' করতে দেখি। অসম্ভব শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর দল এটি। হঠাৎ করে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় দেখি ও দলটি সফলভাবে করছে আলকাপ। তারপরেই বর্ধমানের এক গ্রাম্যমেলায় দেখি অপেরার দল হিসাবে লোকনাট্য করছে। দিল্লি থেকে আগত এক গবেষকের দল তাদের তথ্যচিত্র করে রাখল। এটি তাদের অন্যতম সেরা সংগ্রহ। ১৪ নভেম্বর, ২০০৮, কান্দির (মুর্শিদবাদ) হালিফক্স ময়দনে, কোরাসের ৩০তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে লোক ভেঙে পড়েছিল। আলকাপ করেছিল কাটোয়ার ''রামকৃষ্ণ অপেরা'' পালার নাম ''নীলবিদ্রোহ'' —পরিচালক অধীর মণ্ডল। অধীর লোকনাট্য করে চলেছেন। ভদ্রলোকেরা তাকে অপেরা, লোটো, আলকাপ, যাত্রা যে নামেই ডাকুক না কেন — অনবদ্য পরিবেশনায় তাদের অধীর করেই অধীরের নাম সার্থক হয়।

অজ্ঞাত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বিগত বছরগুলিতে লোকসংস্কৃতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র (মধুসূদন মঞ্চ) লোক সংস্কৃতির গ্রন্থ প্রকাশের - গানের ক্যাসেট নির্মাণে, শিল্প এবং শিল্পীদের উৎসাহ প্রদানে চিকিৎসা এবং অন্যান্য অনুদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বহু লোকশিল্পী ও তাদের মাধ্যমে সর্ববঙ্গে পরিচিত হয়, আর্থিক ও সমাজিক মর্যাদা পায়। মধ্যস্থ কিছু ফড়ে অর্থনৈতিক লভ্যাংশ আত্মসাৎ করলেও লোকশিল্পীরা এ কেন্দ্র থেকে নানাবিধ সহায়তা পেয়েছে। কিন্তু ২০০৮ থেকে এ কেন্দ্র সব কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অর্থে পুষ্ট এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের মদতে পুষ্ট ''বাংলা নাটক ডট কম'' নামে এক এন. জি. ও; লোকশিল্প ও শিল্পীদের জান-মান রক্ষার এবং বিকাশের দায়িত্ব নিয়েছে। নদিয়া জেলার বাউল গানের রক্ষণ এবং বিকাশে এদের তৎপরতা প্রচারিত হয়েছে মুদ্রিত 'সহজগীতি' গ্রন্থে। গ্রন্থটি বাউল - ফকির গানের গ্রন্থ। কিন্তু একটি গানেরও স্বরলিপি এখানে নেই। নদিয়ার প্রখ্যাত পাল্লা বা একক বাউলগানের কোন শিল্পী যেমন—মনসুর ফকির, অর্জুন ক্ষ্যাপা, বীরেন দাস, মিনতি মোহান্ত প্রমুখ এদের নেকনজরে পড়েনি। গানের প্রশিক্ষণ দিয়ে সম্ভবত একজনও নতুন শিল্পী তৈরি হয়নি। সাক্ষরতা আন্দোলনে যেমন পূর্ব সাক্ষরকে নিরক্ষর সাজিয়ে সাক্ষর করে তোলা হয়; সে রকম ব্যাপার গানের প্রশিক্ষণে ঘটলেএ ঘটতে পারে। কিন্তু কাগজ কলমে সব ঠিক চলেছে। বাউলগানের অভাবে গানের প্রসার হয় না। তাই 'সহজগীতি' তো বিপুল ব্যয়, শ্রম এবং গবেষণান্তে বাউল - ফকিরি গানের কথা, সুর বর্জিত হয়ে সংকলিত হয়নি। সংগ্রাহকেরা সত্যবাদী। এ গ্রন্থের সমস্ত গানই কোন না কোন মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সে সময় গ্রন্থের অধিকাংশই বাজারে পাওয়া যায়। সংকলকদের অজ্ঞতার ভান অভিনব। যে সমস্ত 'প্রায়লুপ্ত' গ্রন্থের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে : সেগুলি—

(১) খোন্দকার রফিউদ্দিনের 'ভাবসঙ্গীত' বাংলাদেশে পাওয়া যায় এবং বহু গায়কের কাছে রছেয়ে।

(২) মনুলাল মিশ্র সংকলিত ''ভাবলহরী' -এর ঝকঝকে বই পাবেন ঘোষপাড়ার মেলায় অথবা ৯ অভয় ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০০০৪ এ।

(৩) জালাল গীতিকা (৫ খণ্ড), টাউন লাইব্রেরি, নেত্রকোনা, মোমেহশাহী, বাংলাদেশে।

(৪) হালিম সঙ্গীত, সদর লাইব্রেরী, ৩৯/১ বাংলা বাজার, ঢাকা -১, বাংলাদেশ

(৫) সবার প্রিয় লালন গীতি, বিউটি বুক হাউস, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ওই। বাংলাদেশের প্রকাশিত শরৎ গোঁসাই, মন্টুশা, ওয়াকিল আহ্মদ এবং আমার লালন সাঁই এর গানের বই উল্লিখিত হয় কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে।

(৬) আলোচ্য প্রকাশক দুর্গম গ্রাম, কষ্টকর সংগ্রহ, খাঁটি পরম্পরা এবং জীর্ণগ্রন্থ ও খাতার গল্প ফেঁদেছেন।

আজহারের শিষ্য, গোভাঙ্গা (করিমপুর, নদিয়া) গ্রামের 'শামু পাগল' -এর খাতায় নাকি তিন শতাধিক লালনের গান ছিল। কিন্তু এ গ্রামের শুরু আজাহার ফকির বা তার ছেলে মনসুর (প্রখ্যাত গায়ক) এমন কোন তিনশত লালনের গানের খাতার সন্ধান জানেন না। শামু পাগলের ছেলে আরমান পিতার জীর্ণখাতা থেকে এ গানগুলি সংগ্রাহককে দিয়েছেন। জীর্ণ এ খাতা কি গবেষকদের দেখানো যাবে? আরমানের লালনপন্থী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এভাবে যে সে বাংলাদেশের কাদেরিয়া সুফি গণি পাগলের শিষ্য এবং আরমান বাংলাদেশে যাতায়াত করে। যতদূর জানি কাদেরিয়া এবং গণি পাগলের সঙ্গে লালনের পরম্পরা যুক্ত নয়। সীমান্তের বহু মানুষ পাশপোর্ট ছাড়াই বাংলাদেশে যায়। এবং অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বাউলগানের বই আনে। আর সে সমস্ত বই এবং 'জীর্ণ' ভাবলহরীতে হয়ে যায় সহজগীতির মতো এন. জি. ও এর বই। তবুও স্বেচ্ছায় বানান ভুল করে, এগুলিকে খাঁটি মাল বলে চালাতে হয়। এ রকম দুস্তর, দুঃসাধ্য গবেষণাকৃত সংগ্রহের বাউল গানে ভরে যাবে নদিয়ার মাঠঘাট। অথচ গোবরডাঙ্গার গুরু আজহারের পদসংগ্রহ আমরা মুদ্রিত করেছি। গবেষকেরা তা সন্ধান রাখেন না কি ইচ্ছে করেই?

গবেষক, পাঠকদের ''সহজগীতি'' গ্রন্থভূমিকায় উক্ত জীবন্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তদন্ত চালিয়ে লুপ্ত গ্রন্থ এবং জীর্ণ খাতার সত্যাসত্য নির্ণয় করতেন আহ্বান জানাই। এ গোষ্ঠীতে এক প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ শিল্পী আছেন। তিনি বহু অসাধারণ পদ জানেন। নদিয়ার ফাজিলনগর নিবাসী খিজমত ফকির তাঁর নাম। ভাগ্যিস তার কাছ থেকে একটি গানও সংগ্রাহকেরা পাননি। তাঁর সংগ্রহ মৌখিক এবং লৌকিক। শিষ্টদের বইপত্র বা গালগল্প তার নেই সম্ভবত।

আলোচ্য গ্রন্থের সংগ্রাহকদের পরিচয় —

An initiavive of & Z.C.C, under the SGSY special Projice, "Revival and revitalization of folk art and culture as sustaionable livelyhood" Supported by Ministry of rural development, Government of India, Department of Culture, Government of West Bengal, Implementation Partner - Bangla natak dot com.

ত থ্য সূ ত্র

নামগুলি ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত হয়েছে।

(১) ২৫ সেপ্টেম্বর শিল্পীদের এ জমায়েত হয়েছিল বহরমপুর শহরে।

(২) টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্সের সিনিয়র নৃতত্ত্বের গবেষক ড. রায় বর্ধণের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্যাদি।

(৩) 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মন, জনৈক নারীর নেতৃত্বে লোক-সংস্কৃতি দিয়ে বাহিরাগত জনবিরোধী মাদকতাপূর্ণ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক সংগ্রামের বিবরণ দিয়েছেন। উৎসাহী পাঠক এ উপন্যাস এবং জনজাতির জীবনে নারীর এবং নারী দেবতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পড়তে পারেন।

তরুণী কন্যার পদাঘাত না পেলে নাকি অশোক গাছের ফুল ফোটে না— এ লোক-সংস্কার কাব্য কবিতায় পাওয়া যায়।

(৪) লেখার শেষে এদের পরিচয় দেওয়া আছে।